ঃ এই সংখ্যায় ঃ
১) জগদীশচন্দ্র বসু, ২) হিজলী বাদাম, ৩) স্কুইড, ৪) কৃষ্ণ পদার্থ, ৫) মহাকাশ বক্তৃতা, ৬) রিপোর্ট, ৭) রসায়ন বিদ্যা বর্ষ — ২০১১।

বিজ্ঞান অন্বেষক

গ্রাহক মূল্য
বার্ষিক ১৫ টাকা, যোগাযোগ ঃ বিজ্ঞান অন্বেষক, প্রযত্নে : বিজ্ঞান দরবার, ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড, (বিনোদনগর)
পোঃ কাঁচরাপাড়া-৭৪৩১৪৫
জেলা ঃ উত্তর ২৪ পরগণা।

বর্ষ-৯ সংখ্যা - ১ জানুয়ারী - ফেব্রুয়ারী / ২০১২ RNI No. WBBEN/03/11192 মূল্য : ২

প্লাস্টিক ঃ সভ্যতার আতঙ্ক

প্লাস্টিক— আজকের যুগের সবচেয়ে বেশি পরিচিত নাম। 'প্লাস্টিক' এমনই এক চরিত্র যার ক্ষতিকর ভূমিকা সম্বন্ধে জানলে রীতিমত আঁতকে উঠতে হয়। দূষণের কথা আসলেই প্লাস্টিকের কথা চলে আসে।

প্লাস্টিক পেট্রোলিয়াম নির্ভর পদার্থ যেগুলো অ-পুনর্বীকরণযোগ্য সম্পদ থেকে আসে। শতকরা ৪ শতাংশ তেল খরচ হয় আমাদের নিত্যদিনের প্লাস্টিক তৈরি করতে। আধুনিক সভ্যতার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের প্যাকেজিং এর জন্য প্লাস্টিক তৈরি করতে উৎপন্ন তেলের এক-তৃতীয়াংশ খরচ হয়ে যায়। শতকরা হিসেবে তেলের পরিমাণ যৎসামান্য মনে হলেও বাস্তবে প্লাস্টিক তৈরি করতে লক্ষাধিক টন তেলের খরচ পরে। পেট্রোলিয়াম নিষ্কাশণ ও তার পরিশুদ্ধকরণে পরিবেশের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। প্রচুর পরিমাণে ড্রিলিং বর্জ্য সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্রকে বিঘ্নিত করে।

কিভাবে তৈরি হয়?

প্লাস্টিক তৈরি হয় 'ক্রেকিং' পদ্ধতিতে হাইড্রোকার্বন উত্তপ্ত করার ফলে। অনুঘটকের উপস্থিতিতে বড় বড় অনুগুলোকে ছোট ছোট অনুতে পরিণত করা হয়। পরবর্তীতে এই পদ্ধতিতেই

এরপর 2 পাতায়

জাঙ্ক ফুড প্রসঙ্গে

বর্তমান প্রজন্মের আধুনিকতম খাদ্য তালিকায় যে খাবারগুলির দ্রুত অনুপ্রবেশ ঘটছে সেগুলিই ফাস্ট ফুড বা জাঙ্ক ফুড। ফাস্ট ফুড কর্ণারে যে সব খাবার আকর্ষনীয় বা প্রলোভিত করে সে সবই জাঙ্ক ফুড। এছাড়াও যেগুলি এর তালিকা ভুক্ত তা হল বিভিন্ন লবন ও মশলা যুক্ত চিপস্, কোলা বা ঐ জাতীয় নরম পানীয়, রোল, চাউ, পেস্ট্রি, প্যাটিস, চকোলেট বা যা চট্‌জলদি খাবার তাই এর

আওতায় পড়ে। এই খাবারগুলির ক্যালরী বা শক্তিমূল্য যথেষ্ট, কোন কোনটিতে প্রোটিনের পরিমাণ যথাযথ। তবে এই সব খাবারে বি-

এরপর ৪ পাতায়

জৈব ঘড়ি, জৈব কম্পাস এবং আমরা

উদাহরণ ১ — পায়রা, হাঁস, মুরগী সহ প্রায় সবরকম পাখি এবং পশুরা রাত্রের প্রতি প্রহার জোরে বা আস্তে ডেকে ওঠে সময় জানান দেয়। শীতের রাতে শেয়াল ডাকে সময় মেপে প্রতি প্রহরে। জঙ্গলে জলের উৎসগুলোতে বন্যজন্তুরা জলপান করতে আসে তাদের নির্দিষ্ট সময়ে। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে বিবর্তনের মাধ্যমে এবং অভিযোজনের মাধ্যমে তাদের সময় নির্দিষ্ট হয়েছে। তৃণভোজী ও মাংসাশী প্রত্যেকের আলাদা আলাদা সময় রয়েছে। আবার মাংসাশী প্রাণীদের মধ্যে হিংস্রতা এবং শক্তির নিরিখে সবল এবং দুর্বল জন্তুদের সময় আলাদা। বাঘ যখন জল খেতে আসে তখন লেপার্ড কিংবা শেয়ালরা আসে না। প্রকৃতিগত ভাবেই প্রত্যেকের সময় নির্দিষ্ট রয়েছে।

উদাহরণ ২ — সাইবেরিয়া সহ পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে বিশেষতঃ শীতপ্রধান অঞ্চলগুলো থেকে পরিযায়ী পাখিরা উষ্ণ অঞ্চলগুলোতে আসে। তারা সেখানে বাসা তৈরী করে, ডিমপাড়ে এবং বাচ্চা বড় হবার পর আবার ফিরে যায়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় বাবা এবং মা

এরপর 4 পাতায়

প্লাস্টিক সভ্যতার আতঙ্ক

1 পাতার পর

তৈরি হয় প্রাকৃতিক গ্যাস বা ক্রুড তেল যার থেকে কিছু মনোমার যেমন— ইথিলিন, প্রোপাইলিন, বিউটেন এবং স্টাইরেন প্রভৃতি। এই মনোমারগুলো তারপর রাসায়নিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে চেইন আকারে তৈরি করে পলিমার। এই ধরণের বিভিন্ন প্রকার বন্ধন তৈরি করতে পারে বিভিন্ন প্রকার বৈশিষ্ট যুক্ত প্লাস্টিক। যদিও পলিমারগুলোর মূল উপাদান 'কার্বন' ও 'হাইড্রোজেন' তবুও অন্যান্য কিছু উপাদানও এর সাথে যুক্ত থাকতে পারে। পলি ভিনাইল ক্লোরাইড (PVC) -এ ক্লোরিন রয়েছে, নাইলনে রয়েছে নাইট্রোজেন, ট্যাফ্‌লনে রয়েছে ফ্লুওরিন, পলিএস্টারে রয়েছে অক্সিজেন ইত্যাদি।

কিছু সাধারণ প্লাস্টিক ঃ—

আমাদের চারপাশে বেশ কয়েকটি প্লাস্টিকের দেখা মেলে এর মধ্যে Low Density Polyelthylene (LDPE), High Density Poly ethylene (HDPE), Poly Vinyl Chloride (PVC), এবং Polyethylene-terephthalate (PET) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

Low Density Polyethylene (LDPE)

Polyethylene (PE) দু'প্রকারের যথা— High Density Polyethylene (HDPE) এবং Low Density Polyethlene (LDPE)।

LDPE প্রথম আবিষ্কৃত হয় ১৯৪২ সালে। ব্যাপক আকারে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় এটি ব্যবহৃত হয়। মূলতঃ জলের তলে 'কেবল কোটিং' এবং 'র‍্যাডার ইনসুলেশন' এর জন্য এটি ব্যবহৃত হয়েছিল। অবশ্য ভারতে LDPE কলকাতায় ICI কোম্পানীর দৌলতে ১৯৫৯ সালে উৎপাদিত হতে শুরু করে। পরবর্তীকালে মুম্বইয়ের UCIL (১৯৬১ সালে) এবং বদোদরার IPCL (১৯৭৮ সালে) কোম্পানী এর উৎপাদন শুরু করে। HDPE এর ক্ষেত্রে ১৯৫৭ সালে প্রথম উৎপাদন শুরু হলেও ভারতে ১৯৬৮ সালে মুম্বাইয়ের PIL কোম্পানী উৎপাদন শুরু করে। রিলায়েনস ইন্ড্রাস্ট্রিস লিমিটেড (RIL) বছরে ৪০,০০০০ টন পলিইথিলিন তৈরি করে ভারতে যাদের বাণিজ্যিক নাম 'Reclaire' এবং 'Relene'। রিলায়েন্স ভারতের বাজারে ৬৩ শতাংশ শেয়ার কিনে রেখেছে এর উৎপাদনের জন্য।

Polystyrene

'Styrene' একটি পেট্রোলিয়াম উপজাত পদার্থ। অনেকগুলি 'Styrene' অনু পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে 'Polystyrene' গঠন করে। অবশ্য Styrene এর সাথে বেঞ্জিন, ইথিলিন এবং বিউটাডাইন যুক্ত হয়ে 'Polystyrene' তৈরি হয়। থার্মোকল, স্টাইরোফোম্ ইত্যাদি হলো এক প্রকারের পলিস্টাইরিন। ১৯৩০ সালে প্রথম এটি তৈরি হয় বাণিজ্যিকভাবে যা কৃত্রিম রাবার তৈরি করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্যাপক আকারে ব্যবহৃত হয়। যদিও জার্মান বিজ্ঞানী সিমোন ১৮৩৯ সালে প্রথম এটি আবিস্কার করেন। ভারতে প্রথম মুম্বাইয়ের 'Polychem' ১৯৫৭ সালে বাণিজ্যিকভাবে এটি উৎপাদন করতে সমর্থ হয়।

পলিভিনাইল ক্লোরাইড (PVC)

এক কথায় পলিভিনাইল ক্লোরাইড বা PVC কে 'বিযাক্ত' প্লাস্টিক বলা যায়। এটির প্রাথমিক কাঁচামাল হল খনিজ তেল, প্রাকৃতিক তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস এবং পাথুরে লবন (সোডিয়াম ক্লোরাইড)। এই কাঁচামালগুলো থেকে বিশেষ পদ্ধতিতে 'ইথিলিন' এবং 'ক্লোরিন' তৈরি করা হয় যা পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে ভিনাইল ক্লোরাইড মনোমার (VCM) গঠন করে। পরবর্ত্তীতে এই VCM অনুগুলি পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে 'পলি ভিনাইল ক্লোরাইডে' রূপান্তরিত হয়। এটি প্রথম আবিষ্কৃত হয় ১৯১২ সালে এবং বাণিজ্যিক ভাবে এটির উৎপাদন শুরু হয় ১৯৩১ সালে। ভারতে প্রথমে বাণিজ্যিকভাবে এর উৎপাদন শুরু হয় ১৯৬১ সালে। বর্তমানে রিলায়েন্স ইন্ড্রাস্ট্রিস সবচেয়ে বেশি পরিমানে (বছরে ৩,০০,০০০ টন) PVC তৈরি করে।

Polyethylene - Terepthalale (PET)

দুপ্রকারের Polyethylene - Terepthalale পাওয়া যায় যথা স্বচ্ছ Amorphous type (A-PET) এবং Crystalline বা সাদাটে কেলাসাকার টাইপ (C-PET)। এটি মূলতঃ দুটি রসায়ন 'ইথিলিন গ্লাইকল' এবং 'ডাই মিথাইল-টার-এপ্‌থালেট' এর সংমিশ্রণে তৈরি। এখানে বিষাক্ত ডায়াজোমিথেন, অ্যান্টিমনি অক্সাইড, লেড্অক্সাইড ইত্যাদি প্রয়োজন পরে একে তৈরি করতে। ফাইবর, ফিল্ম তৈরি করতে এটি ব্যবহৃত হয় ১৯৪০ সাল থেকে। বস্তুতঃপক্ষে বিভিন্ন নরম পানীয় -এর বোতল তৈরীতে ব্যাপক আকারে ব্যবহৃত হয় এটি।

পলি কার্বোনেট ঃ— পলিকার্বোনেট তৈরি হয় 'ফস্‌জিন্' গ্যাস থেকে যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্যবহার করা হয়েছিল। এই প্লাস্টিক খুবই উন্নত শক্তপোক্ত গন্ধহীন, চোখে জ্বালাও সৃষ্টি করে না সেই অর্থে। মূলতঃ বাচ্চাদের বোতল, ফ্লাস্ক প্রভৃতি তৈরি হয় এটি দিয়ে।

পলি ইউরেথেন ঃ— বেশিরভাগ পলি ইউরেথেন 'থার্মো প্লাস্টিক' জাতীয় পদার্থ। এদের কখনই গলানো কিংবা পূর্ণ আকার দেওয়া যায় না। এটি তৈরিতে 'ক্লোরিন' অন্তবর্তীকালীন যৌগ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

পলিপ্রোপাইলিন ঃ— 'পলিপ্রোপাইলিন' বহু কাজে ব্যবহৃত প্লাস্টিক। এটি Bopp (Biaxally Oriented Plypropylene) এবং TQPP (Tubular Quench Polypropylene) তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। ১৯৫৭ সালে এর উৎপাদন শুরু হলেও ভারতে প্রথম এটি উৎপাদিত হয় ১৯৭৮ সালে। এটি তীব্র দাহ্য এবং বিস্ফোরক পদার্থ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের EPA (Environmental Protection Agency) এর মতে পৃথিবীর ভীষণ ক্ষতিকারক প্রথম ৬টি রাসায়নিকের মধ্যে প্রথম ৫টিই প্লাস্টিক থেকে প্রাপ্ত এবং প্লাস্টিকদের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিকারক প্রথম শ্রেণীর ক্ষতিকারক। এটি মূলতঃ আলু চিপস, চানাচুর প্রভৃতির প্যাকেট তৈরি হয় এটি থেকে।

এক ঝলকে বিভিন্ন প্রকার প্লাস্টিকের বাণিজ্যিক ব্যবহার ঃ—

যথা ঃ- ১) পেপসি কাপ, ডিসপোসেবল ফোমি প্লাস্টিক কাপ, প্লাস্টিকের স্টায়ার প্লেটস্, থার্মোকল, কম্পিউটার, টেলিভিশন প্রভৃতির প্যাকেজিং বাক্স, ক্যাসেটস্—ব্যবহৃত প্লাস্টিক ঃ-পলিস্টাইরিন।

যথা ঃ- ২) বাক্স, কৌটা, বালতি, সমস্ত দুগ্ধজাত দ্রব্য রাখার পাউচ্,

এরপর 3 পাতায়

প্ল্যাস্টিক সভ্যতার আতঙ্ক

2 পাতার পর

নরম প্লাস্টিকের পাত্র গামলা, কাপ ও প্লেট, সিমেন্ট ও সার রাখার ব্যাগ, তেলের বোতল, ক্যারি ব্যাগ বা পলিব্যাগ ইত্যাদি—ব্যবহৃত প্লাস্টিক ঃ- LDPE, HDPE

যথা ঃ- ৩) চিরুনী, আলু চিপস্ চানাচুর প্রভৃতির প্যাকেট, ব্যাগ ইত্যাদি—ব্যবহৃত প্লাস্টিক ঃ- পলিপ্রোপাইলিন।

যথা ঃ- ৪) তার, পাইপ, বিদ্যুৎবাহী তার, জুতার সোল, বাচ্চাদের খেলনা, চিকিৎসা পরিষেবায় ব্যবহৃত রক্ত এবং প্লাজমা স্থানান্তকরণ ব্যাগ ইত্যাদি—ব্যবহৃত প্লাস্টিক ঃ- পলিভিনাইলক্লোরাইড।

যথা ঃ- ৫) বাচ্চাদের দুধ খাওয়ানোর বোতল, বড়/ ছোট জলের বোতল, লেন্স, ফ্লাস্ক ইত্যাদি—ব্যবহৃত প্লাস্টিক ঃ- পলিকার্বোনেট।

যথা ঃ- ৬) ফোমযুক্ত ম্যাট্রেস, বালিস, অটোমোবাইল সিট, ইনসুলেটর হিসেবে, রেফ্রিজেরেটর প্রভৃতি—ব্যবহৃত প্লাস্টিক ঃ- পলিইউরেথেন।

যথা ঃ- ৭) বিভিন্ন জার, বোতল—ব্যবহৃত প্লাস্টিক ঃ- পলিইথিলিন-টার-এপথ্যালেট।

কোন প্রকারের প্লাস্টিক কি ক্ষতি করে ?

১) পলিইথিলিন ঃ— এটি তৈরিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার ধাতু যেমন সিসা, ক্যাডমিয়াম স্নায়ু, ফুসফুস, হৃৎপিন্ড, বৃক্ক (নেফ্রাইটিস্) প্রভৃতি অঙ্গের ক্ষতি করে। এছাড়া ডায়াবেটিস, উচ্চরক্তচাপ, হৃৎপেশির দুর্বলতা প্রভৃতি রোগ ঘটাতে সাহায্য করে। এটি পোড়ালে ফরম্যালডিহাইড ও অ্যাসিটালডিহাইড গ্যাস তৈরি হয় যা আরও ক্ষতিকারক। ক্যানসার-এর মত রোগ ঘটাতে পারে।

২) পলিস্টাইরিন ঃ— এতে রয়েছে বেঞ্জিন, স্টাইরিন, ১,৩ বিউটাডাইন, কার্বন টেট্রাক্লোরাইড যা ক্যানসার ঘটাতে সক্ষম। এছাড়া বৃক্কের সমস্যা, চোখ, নাক, গলা প্রভৃতির সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।

৩) পলিপ্রোপাইলিন ঃ— এখানেও সিসা ক্যাডমিয়ামের মত ভারী ধাতু ব্যবহৃত হয় তাই এর ক্ষতিকর দিকটাও অনেকটা পলিইথিলিনের মত।

৪) পলিভিনাইল ক্লোরাইড ঃ— এটিতে থ্যালেট, ডি.ই.এইচ.পি. জাতীয় দ্রব্য ব্যবহৃত হয় বলে ক্যানসার, যকৃৎ এবং বৃক্কে ক্ষত প্রভৃতি সৃষ্টি করতে পারে, জননগত কিছু অস্বাভাবিকতা, প্রজনন ক্ষমতা লোপ, যকৃৎ এবং বৃক্কের ক্যানসার ইত্যাদি ঘটাতে পারে।

৫) পলিকার্বোনেট ঃ— প্লাস্টিকদের মধ্যে সবচেয়ে কমক্ষতি করলেও সম্প্রতি জানা গেছে, যে এটিতে 'বিসফেনোল-এ' নামক রাসায়নিক পদার্থ থাকে যা অন্তক্ষরাঃ গ্রন্থিকে প্রভাবিত করে হরমোন ক্ষরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। ফলস্বরূপ হরমোন জনিত বিভিন্ন সমস্যা বিশেষ করে শিশুদের বৃদ্ধি, ব্যবহার মস্তিষ্কের গঠন ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৬) পলিইউরোথেন ঃ— এটি তৈরিতে বিভিন্ন ক্ষতিকর পদার্থ যেমন আইসোসায়ানেট, ডাইএমাইনস্, মিরিলিন ফ্লোরাইড, সিএফসি প্রভৃতি প্রয়োজন পরে যা ফুসফুস, রক্ত সংবহন ইত্যাদি প্রক্রিয়ার উপর কাজ করে।

৭) পলিইথিলিন-টার এপ্থ্যালেট ঃ— ই.পি.এ-এর মতে এটি ক্যানসার ঘটাতে সক্ষম। এতে রয়েছে অ্যাসিটালডিহাইড, তাই চোখ, চামড়া, শ্বাস অঙ্গ প্রভৃতির ক্ষতি করে।

বর্তমান সভ্যতা এবং প্লাস্টিক

আজ আমাদের জীবনের বহুক্ষেত্রে প্লাস্টিক নির্ভরতা বহুগুন বেড়ে গেছে। এখন এমনও প্লাস্টিক তৈরি হয়েছে যা নিজের ওজনের বেশ কয়েক গুন অধিক জল ধারণ ক্ষমতা রাখে। এরকমই উপাদান ব্যবহার করা হয় স্যানিটারি ন্যাপকিন্, ডায়াপার প্রভৃতি। আবার গাছের গোড়ায় এই পলিমার ব্যবহার করে মরু অঞ্চলে শুকনো আবহাওয়ায় কৃষিকাজ করা হচ্ছে ইজরায়েলের মত দেশে যাকে Drip Cultivation বলা হয়। অ্যাসিটিলিন, অনুঘটক এবং আয়োডন মিশিয়ে তৈরি হয় বহুগুন বিদ্যুৎ পরিবহন ক্ষমতাবায়ী বিদ্যুৎবাহী তার যার ক্ষমতা তামার চেয়ে অনেক গুন বেশি। গৃহস্থালী, কৃষি, চিকিৎসা, যানবাহন, মহাকাশ প্রযুক্তি, বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষার কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, শিল্প, বিনোদন, খেলাধুলা প্রভৃতি ক্ষেত্রে পলিমারের অগ্রগতি অব্যাহত। যেভাবে প্লাস্টিকের জঞ্জাল আমাদের চারপাশে প্রতিনিয়ত ছেয়ে যাচ্ছে তাতে হয়ত একদিন আমাদের 'হাইটেকের এই সভ্যতা' প্লাস্টিকের চাদরে মুড়ে যাবে—আর তখনই মানবসভ্যতার অগ্রগতির বিজয় রথ আটকে যাবে।

তাহলে করণীয় ?

১) এখনই 'প্লাস্টিক' নিয়ে ভাববার প্রয়োজন আছে। সস্তা এবং সহজে পাওয়া যায় বলে একে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যবহার করে ছুঁড়ে ফেলে না দিয়ে প্রয়োজন আছে 'Recycle' পূনরাবর্তন করার। পুরানো প্লাস্টিককেই বারবার ব্যবহার করা যেতে পারে—এতে প্লাস্টিকের ব্যবহার অনেকটাই কমবে। বস্তুতঃপক্ষে অনেক উন্নত দেশে একইরকম পদ্ধতি চালানোর প্রচেষ্টা চলছে।

২) প্লাস্টিকের উপর নির্ভরশীলতা যতটা সম্ভব কমানোর প্রয়োজন আছে। সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও চাঙ্গা করা দরকার। প্যাকেজিং এর জন্য শতকরা ৫২ ভাগ ব্যবহৃত হয়, কাজেই এই ব্যবহার কমিয়ে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৩) পলিমার (প্লাস্টিক) ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত ভাবে করতে হবে। উৎপাদনকারী কোম্পানীগুলোর জন্য সুস্পষ্ট এবং কঠোর সরকারী নির্দেশিকা জারী করার প্রয়োজন রয়েছে। উৎপাদিত দ্রব্যগুলোর গায়ে বিধিবদ্ধ সর্তকীকরণ দেওয়া দরকার।

৪) যেখানেই বিকল্প ব্যবস্থা সম্ভব সেখানেই পারত পক্ষে প্লাস্টিক ব্যবহার না করা।

গবেষণা চলছে এমন পলিমার তৈরি যা অন্যান্য প্রাকৃতিক উপাদানের মত ফেলে রাখলে মাটিতে মিশে যাবে। এই জীবাণু ক্ষয়িষ্ণু (Biodegradable) পলিমার একদিন হয়তো আবিষ্কৃত হবে - ততদিন আমাদের শ্লোগান হোক Three R অর্থাৎ Reduce, Re-Use এবং Recycle প্লাস্টিক।

লেখক ঃ রাজা রাউত, জলপাইগুড়ি, সায়েন্স এন্ড নেচার ক্লাব
ফোন ঃ ৯৪৭৪৪১৭১৭৮, Email : *rajarouthbhbl@gmail.com*

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ ১) **Plastics-A threat to Mankind**
২) 'জ্ঞানবিচিত্রা - ডিসেম্বর, ২০০৬

জৈব ঘড়ি, জৈব কম্পাস এবং আমরা

1 পাতার পর

পাখি আগেই চলে যায় আর বাচ্চা সম্পূর্ণভাবে আকাশে ওড়ার উপযুক্ত হলে তবেই যাত্রা শুরু করে। আশ্চর্যের বিষয় বচ্ছে যে যাত্রাপথ অচেনা হওয়া সত্ত্বেও তারা ঠিকঠিক পথ চিনে বাবা মায়ের দলের সাথে মিলিত হয়।

উদাহরণ ৩ — আমি একদিন পড়ন্ত বিকেলে সাইকেল চেপে গ্রাম দেখতে বেরিয়েছি। যেতে ভুল করে চেনা পথ ছেড়ে কিছুটা যাবার পর পথ হারিয়ে ফেললাম। যেখানে পৌছলাম সেটা একটা পরিত্যক্ত বাড়ী। তারপর আর রাস্তাই নেই। এদিকে অন্ধকার হয়ে এল। সেই ঘুটঘুটে অন্ধকারে মেঠোপথের অস্পষ্ট রেখা ধরে চলতে শুরু করলাম। রাস্তায় জনপ্রাণী নেই যে জিজ্ঞেস করব। এই অবস্থায় আন্দাজে এবং শহরের দিকের আকাশে আলোর আভাস লক্ষ্য করে রাত ৮টায় একটা জায়গায় এসে দেখলাম সেটা একটা ছোট বাজার এবং আমার চেনা জায়গা। সেখান থেকে ৪৫ মিনিট সাইকেল চালিয়ে বাড়ীতে পৌঁছলাম।

প্রকৃতির সৃষ্টি এই জীজগতে অবিরত ঘটে চলা অজস্র আশ্চর্যজনক ঘটনার মতো এটাও একটা ঘটনা যে পাখি পশু এবং কীটপতঙ্গরা সময় মেপে কাজগুলো করে। কিন্তু কিভাবে? ধরা যাক, বাগ যখন জল খেতে এল তখন ভুল করে নেকড়ে কিংবা হায়না চলে এল সেখানে। কারণ শিকার ধরার ক্ষেত্রে এরা পরস্পর পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। সুযোগ পেলেই এরা একে অন্যের কাছ থেকে শিকার কেড়ে বা চুরি করে খায়। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। সেরকম প্রতি প্রহরে অর্থাৎ প্রায় ৩ ঘন্টা পরপর শেয়াল, পায়রা, ভাল্লুক, পেঁচা ডেকে ওঠে। ওরা এটা করতে পারে কারণ এদের মস্তিষ্কে সময় মেপে সেই কাজগুলো নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা রয়েছে। যাকে আমরা জৈব ঘড়ি বলতে পারি। এককোষী প্রাণী থেকে কোটি কোটি বছরের বিবর্তনের মাধ্যমে এই জৈবঘড়ি বিকশিত হয়েছে ভাবলে অবাক লাগে।

ঠিক তেমনই অজানা অচেনা পথে গিয়ে সঠিক জায়গায় পৌঁছনো, যেমন পরিযায়ী পাখিরা করে থাকে তাকে আমরা জৈব কম্পাস বলতে পারি। অবশ্য কম্পাস বলতে আমরা যে যন্ত্র বুঝি এটা তা নয়। আকাশের গ্রহ নক্ষত্রদের আলোকসজ্জা, বিভিন্ন সময়ে আকাশে তাদের অবস্থান ইত্যাদি যুগ-যুগান্ত ধরে তাদের পরিক্রমণে সহায়তা করছে। এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে এদের শরীরের বিশেষ গন্ধ (ফেরোমন), এদের ডাক বা আওয়াজ যা অনুসরণকারী সেই প্রজাতির প্রাণীদের জন্য সংকেত হিসাবে কাজ করে। যেমন বিশেষ এক ধরণের প্রজাপতি তাদের জীবনের একটা পর্যায়ে প্রায় ১০ হাজার কিমি পথ পাড়ি দিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছয়। সেখানে পর্যাপ্ত খাবার খায় বংশবিস্তার করে আবার ফিরে আসে আগের জায়গায়। সেই সুদীর্ঘ যাত্রাপথে পথ প্রদর্শক হিসাবে একটা প্রজাপতি সবার আগে গিয়ে সঠিক জায়গা খুঁজে নেয়। তার শরীর নিসৃত ফেরোমন এর গন্ধ অনুসরণ করে বাকী প্রজাপতিরা সেখানে পৌঁছয়। আবার গভীর সমুদ্রে বিচরণকারী তিমি প্রতি বছর প্রায় ১৫ হাজার কিমি সমুদ্র সাঁতরে অপেক্ষাকৃত উষ্ণ অঞ্চলে পৌঁছয়। সেখানে পর্যাপ্ত খাবার খায়, বাচ্চা দেয়, তারপর সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে ফিরে আসে।

জীব জগতের অন্যান্য প্রাণীদের মতোই সময়জ্ঞাপক এবং দিক নির্দেশক ব্যবস্থা আমাদের অর্থাৎ মানুষের মধ্যে রয়েছে। আমাদের শরীরের বিভিন্ন জৈব-রাসায়নিক উপাদান, স্নায়ুতন্ত্র এবং সর্বোপরি আমাদের মস্তিষ্কে এই ব্যবস্থা রয়েছে। আমাদের পূর্বপুরুষরা যখন থেকে যাযাবরের জীবন ছেড়ে স্থায়ী বসতি গড়ে তোলা শুরু করল তখন থেকে আমাদের দিক নির্ণায়ক ক্ষমতা হ্রাস পেতে শুরু করল। এখন তো আমরা ভোরবেলা আর বিকেলবেলা ছাড়া দিক নির্ণয় করতে পারি না। সেরকম ঘড়ি আবিষ্কারের পর থেকে আমাদের সহজাত সময় জ্ঞাপক ব্যবস্থাও ধীরে ধীরে লোপ পেতে বসেছে। এলার্ম ছাড়া সকালে ঘুম ভাঙে না। ব্রেক ফাস্টের টেবিলে বা পড়তে বসার পরও ঘুমের রেশ থেকে যায়। রাত ১২টা ১টার সময় বড় বাথরুম পায়, ভোর তিনটে চারটের সময় ক্ষিদে পায়, যচ্ছেতাই অবস্থা।

অবশ্য সহজাত এবং স্বয়ংক্রিয় এই ব্যবস্থাগুলোকে আমরা অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যবহারযোগ্য এবং চাঙ্গা করতে পারি। প্রথমে আমাদের জৈবঘড়ির কথাই বলি। মনোবিজ্ঞানের পরিভাষায় একটা কথা আছে যার নাম 'অটোসাজেশন'। অর্থাৎ ক্রমাগত কোন একটা বিষয়ে মনে মনে আউড়ে গেলে সে বিষয়ে মস্তিষ্কে একটা ধারণা তৈরি হয়। পরবর্তী সময়ে মস্তিষ্ক স্বয়ংক্রিয়ভাবে শরীরের নির্দিষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গে নির্দেশ পাঠায় এবং আমাদের শরীরে সেই মতো ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ঘটে। আমি এবং আমার মতো অনেক লোক আছেন যাঁরা যত সমস্যাই থাকুকনা কেন শোয়ার সাথে সাথেই ঘুমিয়ে পড়েন এবং রাতে যত দেরী করে ঘুমোতে যান না কেন ভোরবেলা নির্দিষ্ট সময়েই ঘুম থেকে ওঠেন। ''শোবার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ব' এবং 'সকালে এতটার সময় ঘুম থেকে উঠব'—কথাগুলো যদি মনে হয় ক্রমাগত আওড়ানো যায় তবে এক সময় মস্তিষ্ক সেই মতো আমাদের ঘুম পাড়িয়ে দেবে অথবা নির্দিষ্ট সময়ে জাগিয়ে দেবে। এই 'অটোসাজেশন' এর প্রভাবে মানুষ অসাধ্যসাধন করতে পারে। এবিষয়ে পরে আলোচনা করা যাবে। সোজা কথায় 'সময় মতো' করার যাবতীয় কাজ আমরা কোন রকম অ্যালার্ম ছাড়াই করতে পারি। তারজন্য অনুশীলন করতে হবে। মস্তিষ্কে নির্দেশ পাঠাতে হবে। শরীর যদি অসুস্থ থাকে তবে এই ব্যবস্থা সাময়িক বাধা পেতে পারে। কোন রকম নেশা থাকলে আমাদের জৈবঘড়ি 'স্লো-ফাস্ট' হবে। শোবার আগের দুই ঘন্টার মধ্যে টিভি দেখলে বা চা-কফি পান করলে জৈব ঘড়ি কাজ করবে না।

জৈব-কম্পাস বা সহজাত দিক নির্দেশক ব্যবস্থাকে পুর্নব্যবহারযোগ্য করতে হলে প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ জরুরী। বিশেষ করে ঋতু পরিবর্তনের খুঁটিনাটি এবং অবশ্যই আকাশ পর্যবেক্ষণ। সূর্য প্রতিদিন পূর্বদিকে ওঠে এবং পশ্চিমে অস্ত যায়। ভূপৃষ্ঠে স্থিরবস্তুর যে ছায়া পড়ে তা কোন দিনই একরকম হয় না। মাটিতে পোঁতা একটা কাঠির ছায়া গতকাল দুপুর একটা চল্লিশ মিনিটে যে বিন্দুতে ছিল আজ সেখানে থাকবে না। আগামীকাল আরো একটু সরবে যদিও সময়টা একই। আকাশের তারাগুলোকেও রাতের এক এক সময়ে এক এক জায়গায় দেখা যায়।

এরপর 9 পাতায়

আন্তর্জাতিক রসায়নবিদ্যা বর্ষ - ২০১১

রসায়নে নোবেলের একশ বছর - ফিরে দেখা

তাত্ত্বিক রসায়ন বিদ্যা এবং রাসায়নিক বন্ধনী

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কনাবাদী বলবিদ্যার বিকাশ, রাসায়নিক বন্ধনীর প্রকৃতি বুঝতে সাহায্য করে। রাসায়নিক বন্ধনীর প্রকৃতি বিষয়ক গবেষণায় লাইনাস পাউলিংকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় ১৯৫৪ সালে, এক্স-রশ্মি অপবর্তন পদ্ধতির সাহায্যে প্রোটিন সম্পর্কে পাউলিং-এর গবেষণা যুগান্তর তৈরী করে। ১৯৮২ সালে আরন ক্লুগকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। তাঁর গবেষণার বিষয় ক্রিস্টালোগ্রাফিক ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপি। তিনি ভাইরাস এবং ক্রোমাটিনের মতো বৃহদাকার নিউক্লিক অ্যাসিড-প্রোটিন কমপ্লেক্সের গঠন ব্যাখ্যা করেন।

অজৈব এবং নিউক্লিয় রসায়ন

হাইড্রোজেন এবং নাইট্রোজেন গ্যাস সংযোগে অ্যামোনিয়া প্রস্তুতির শিল্প পদ্ধতিটি আবিষ্কার করেন জার্মান রসায়নবিদ ফ্রিৎজ হেবার। এটি অ্যামোনিয়া উৎপাদনের শিল্প পদ্ধতি। বেশি পরিমাণে অ্যামোনিয়া উৎপাদনের জন্য হেবার পদ্ধতিটি বিশেষ সুবিধাজনক এবং এই পদ্ধতিতে উৎপাদন খরচ অপেক্ষাকৃত কম। কার্ল বস্ এই পদ্ধতির উন্নতি সাধন করেন। এতে বিপুল পরিমাণ অ্যামোনিয়া উৎপাদন সম্ভব হয়। অ্যামোনিয়া ব্যবহার করে বিভিন্ন প্রকার নাইট্রোজেন ঘটিত যৌগ তৈরী করা সম্ভব হয়। ১৯১৮ সালে হেবার এবং ১৯৩১ সালে বস্ ও ফ্রেডরিখ্ বার্জিয়াস নোবেল পুরস্কার পান। তেজস্ক্রিয় মৌল রেডিয়াম এবং পোলোনিয়াম আবিষ্কারের জন্য মেরী স্কলোডোওস্কা কুরী (Marie Sklodowska Curie) ১৯১১ সালে নোবেল পুরস্কার পান। " In recognition of her services to the advancement of chemistry by the discovery of the elements radium and polonium, by the isolation of readium and the study of the nature and compounds of this remarkable element". ১৯৩৪ সালে নিউট্রন কণার সাহায্যে অতেজস্ক্রিয় মৌলকে আঘাত করে তেজস্ক্রিয় মৌল তৈরী করলেন ফ্রেডোরিক জোলিও এবং আইরিন জোলিও কুরী। ১৯৩৫ সালে এঁদেরকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। নিউক্লিয় বিভাজন প্রক্রিয়া আবিষ্কারের জন্য ১৯৪৪ সালে অটো হানকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। ইউরেনিয়ামোত্তর মৌলসমূহ আবিষ্কারের জন্য ১৯৫১ সালে এড্‌উইন ম্যাটিসন ম্যাক্‌মিলান এবং গ্লেন থিয়োডোর সিবর্গকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়।

রাসায়নিক গঠন

বায়োলজিক্যাল ম্যাক্রোমলিকিউল যেমন, প্রোটিন এবং নিউক্লিক অ্যাসিডের গঠন নির্ণয়ের কাজ কয়েকটি নোবেল পুরস্কার জিতে নেয়। ইনসুলিন-প্রোটিনের গঠন তুলে ধরেন ফ্রেডেরিক স্যাঙ্গার। ১৯৫৮ সালে তাকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। গ্লোবিউলার প্রোটিনের গঠন আবিষ্কারের জন্য জন কাউডারি কেন্ড্রু এবং ম্যাক্স কার্ডিনান্ড পেরুৎজ নোবেল পুরস্কার পান ১৯৬২ সালে।

জৈব রসায়ন

জৈব রসায়ন প্রথম নোবেল পুরস্কার আসে ১৯০২ সালে। পান হারমান এমিল ফিশার। ফিশার সুগার এবং পিউরিন সংশ্লেষের জন্য নোবেল পান। ভিক্টর গ্রিগনার্ড ১৯০৫ সালে জৈব ম্যাগনেসিয়াম হ্যালাইডসমূহ আবিষ্কার করেন এবং বিভিন্ন জৈব যৌগ সংশ্লেষের ক্ষেত্রে এটিকে প্রয়োগ করেন। এই কাজের জন্য ১৯১২ তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। তাঁর নামানুসারে এই মিশ্র জৈব ধাতব যৌগসমূহ 'গ্রিগনাড' বিকারক' নামে পরিচিত। জৈব সংশ্লেষের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য ১৯৬৫ সালে রবার্ট বার্নস ইডওয়ার্ডকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। তিনি কোলেস্টেরল, ক্লোরোফিল এবং ভিটামিন বি১২ এর মতো জটিল বহুসংখ্যক প্রাকৃতিক পদার্থের সংশ্লেষ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। জৈব সংশ্লেষের এক বিশেষ তত্ত্ব ও পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য ১৯৯০ সালে ইলিয়াস জেমস কোরেকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। কার্বনের বহুরূপতার একটি বিশেষ সংযোজন হলো ফুলারিন বা বাক্‌মিন্সটার ফুলারিন। এটি কার্বনের নিয়তাকার রূপভেদ এবং এটিই কার্বনের বিশুদ্ধতম রূপভেদ। রিচার্ড স্ম্যালে ১৯৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম এই জাতীয় বহুরূপতার কথা বলেন, যাতে কার্বন পরমাণুগুলি গুচ্ছ আকারে অবস্থান করে। যেমন, C_{60} হল ৬০টি কার্বন পরমাণু সমন্বিত অণু। অণুটি দেখতে ফুটবলের মতো। আবার C_{70} অণুটি দেখতে রাগ্‌বি বলের মতো। বর্তমানে এই জাতীয় বেশ কিছু গুচ্ছ-অণুর কথা জানা গেছে, যেগুলিকে C_n এই সাধারণ সংকেতের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়। n-এর মান কেবল জোড় সংখ্যায় ৩০-৬০০ এর মধ্যবর্তী হয়। এদের সবগুলিই বহুস্তলক জ্যামিতি বিশিষ্ট, যাতে পঞ্চভুজাকার ও ষড়্‌ভুজাকার তল বর্তমান। কার্বনের এই জাতীয় আনবিক গুচ্ছকে একত্রে কুলারিন বা বাকমিনস্টার ফুলারিন বলা হয়। ফুলারিনের অতি পরিবাহিতা ধর্ম আছে। ফুলারিন আবিষ্কারের জন্য রবার্ট এফ. কার্ল, রিচার্ড ই. স্ম্যালে এবং হ্যারল্ড ডব্লু ক্রোটোকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় ১৯৯৬ সালে। ওয়াল্টার নরমান হাওয়ার্থ শর্করা রসায়নে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেন। গ্লুকোজের বলয় গঠন আবিষ্কার করেন। ভিটামিন-সি সংশ্লেষ করেন। তাঁর দেখা নো পথেই বর্তমানে কৃত্রিমভাবে ভিটামিন-সি তৈরী হয়। পল কারার ক্যারোটিন এবং ভিটামিন-এ র গঠন নির্ধারন করেন। রিচার্ড কুহন ক্যারোটিনয়েডস বিষয়ে গবেষণা করেন। ভিটামিন বি২ এর গঠন প্রকাশ করেন। ভিটামিন বি৬ তৈরী করেন। বিজ্ঞানী হাওয়ার্থ ও কারারকে ১৯৩৭ সালে এবং কুহন্‌কে ১৯৩৮ সালে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। ১৯৪৭ সালে নোবেল পুরস্কার পান

রসায়নে নোবেল

5 পাতার পর

রবার্ট রবিনসন। তাঁর গবেষণা উদ্ভিদ-উপক্ষার (যেমন মরফিন) বিষয়ে। তিনি স্টেরয়েড হরমোন সংশ্লেষ করেন। পেনিসিলিনের গঠন আবিষ্কার করেন।

পলিমার এবং কলয়েড

অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু রাসায়নিকভাবে পরপর যুক্ত হয়ে যে দীর্ঘ শৃঙ্খল বিশিষ্ট বৃহদাকার অণু গঠন করে যাদের আনবিক গুরুত্ব ১০০০০ থেকে কয়েক লক্ষ হতে পারে, তাদেরকে বলে পলিমার অনু। প্লাস্টিক, রবার ও তন্তু এই তিন ধরণের পদার্থই পলিমার পদার্থ। ম্যাক্রোমলিকিউলার কেমিস্ট্রিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কারণে ১৯৫৩ সালে হারমান স্টাওডিনজারকে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়। যেসব মলিকিউল বা অণুর আনবিক গুরুত্ব ১০০০০ এর বেশি তাদের নির্দেশ করতে স্টাওডিনজার 'ম্যাক্রোমলিকিউল' শব্দটি প্রচলন করেন। পলিমার রসায়ন এবং প্রযুক্তিতে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেন গিউলিও নাটা এবং কার্ল জিয়েগলার। ১৯৬৩ সালে এঁরা নোবেল পুরস্কার পান। ম্যাক্রোমলিকিউলার ভৌত রসায়নের তাত্ত্বিক এবং পরীক্ষামূলক উভয় ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কারণে পল জে. ফ্লোরিকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় ১৯৭৪ সালে। নাইলন ও সিন্থেটিক রবার বিষয়েও ফ্লোরিল গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ। কন্ডাক্টিভ পলিমারের আবিষ্কার এবং উন্নতি সাধনের জন্য ২০০০ সালে নোবেল পুরস্কার পান অ্যালান জে. হিগের, অ্যালান জি. ম্যাকডিয়ারমিড এবং হিডেকি শিরাকাওয়া।

বায়োকেমিস্ট্রিঃ— জেম্‌স ব্যাট্‌চেলার সামার দেখান যে উৎসেচককে কেলাসে পরিণত করা সম্ভব। জন হাউয়ার্ড নর্থরপ এবং উইন্ডেল মেরেডিথ স্ট্যানলে বিশুদ্ধরূপে এনজাইম এবং ভাইরাস প্রোটিন তৈরী করেন। এই তিনজনকে ১৯৪৬ সালে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। সালোকসংশ্লেষ এবং শ্বসন জীবদেহে এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিপাকক্রিয়া সম্পর্কিত গবেষণা কয়েকটি নোবেল পুরস্কার জিতে নেয়। উদ্ভিদ দেহে কার্বন ডাই অক্সাইড আত্তীকরণ বিষয়ে গবেষণার জন্য মেলভিন ক্যালভিনকে ১৯৬১ সালে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। কেমিওস্‌মোটিক তত্ত্বের প্রবক্তা পিটার ডি. মিট্‌চেল। বায়োলজিক্যাল এনার্জি কিভাবে ট্রান্সফার হয় তা মিটচেল তাঁর তত্ত্বের সাহায্যে দেখান। ১৯৭৮ সালে মিট্‌চেল নোবেল পুরস্কার পান। অ্যাডিনোসিন ট্রাই ফসফেট সংশ্লেষ বর্ণনা করেন পল ডি বয়ার। আয়ন ট্রান্সপোর্টিং এনজাইম প্রথম আবিষ্কার করেন জেনস সিস্কু। এঁরা ১৯৯৭ সালে নোবেল পুরস্কার পান। সুগার নিউক্লিওটাইড্‌স-এর আবিষ্কার এবং কার্বোহাইড্রেটের বায়োসিন্থেসিসে এর ভূমিকা সম্পর্কিত গবেষণায় ১৯৭০ সালে নোবেল পুরস্কার পান লুইস এফ. লেলোইর। নিউক্লিক অ্যাসিড বিষয়ক গবেষণায় কয়েকটি নোবেল পুরস্কার আসে। নিউক্লিক অ্যাসিডের বায়োকেমিস্ট্রি; বিশেষতঃ রিকম্বিন্যান্ট ডি এন এ এবং নিউক্লিক অ্যাসিডে বেস সিকোয়েন্স নির্ণয়ের কাজে ১৯৮০ সালে নোবেল পুরস্কার পান পল বার্গ, ওয়াল্টার গিলবার্ট এবং ফ্রেডেরিক স্যাংগার। রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিডের অনুঘটকীয় আচরণ আবিষ্কারের জন্য ১৯৮৯ সালে নোবেল পুরস্কার পান সিডনে অল্টম্যান এবং টমাস আর. চেক।

লেখকঃ- গোবিন্দ দাস, ৯৩৩২৪৩১১০২ / ৮৪২০০৪০৮৫২

বিজ্ঞান মনস্কতা প্রসার কর্মসূচী

কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম ও বিজ্ঞান অন্বেষক যৌথ উদ্যোগে কোচবিহার জেলার বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ১৮ ডিসেম্বর সারাদিনব্যাপী কোচবিহার উচ্চ বালিকাবিদ্যালয়ে পরিবেশ, জলাভূমি ও জলদূষণ বিষয় নিয়ে প্রশ্নোত্তর, কর্মশালা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন অঞ্চলের ১৬টি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেন।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে কোচবিহার উচ্চবালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মায়া অধিকারী বলেন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞান মনস্কতা গড়ে তোলার জন্য ধারাবাহিকভাবে কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম সারা বছর ধরে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পরিবেশ দূষণ, অবৈজ্ঞানিক ভাবনা চিন্তা সহ বিভিন্ন সময়ে সচেতনা প্রসার কর্মসূচী বানিয়ে থাকেন। কোচবিহার শ্রী রামকৃষ্ণ বয়েজ হাইস্কুলের ডঃ অমিতাভ চক্রবর্ত্তী, রামজীবন ভৌমিক, তল্লিগুড়ি হাইস্কুলের সুরজিত নাথ, মিতাই কেশরী বাড়ী হাইস্কুলের বিশু মারডি প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জলাতঙ্ক রোগ, ৭ম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য জল দূষণ, ৮ম শ্রেণী জন্য যানবাহন দূষণ, নবম শ্রেণীর জন্য জলাভূমি প্রকৃতির কিডনি বিষয়গুলি নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রশ্নপত্র, সমীক্ষা, কর্মশালায় ১০০ এর মত ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। খাগড়াবাড়ী হরেন্দ্র চন্দ্র বিদ্যামন্দির হাইস্কুলের মৌসুমী পাল, পিংকি শর্মা, কোচবিহার উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের দেবযানী ঘোষ, গায়েত্রী নাগ, অঙ্কিতা পাল, স্নেহা দাস, কলাবাগান হাইস্কুলের সৌরভ কাজী প্রমুখ ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কার দেওয়া হয়। সারা দিনের অনুষ্ঠানে নীলকুঠি ওয়েল ফেয়ার অরগানাইজেশন ফর হিউম্যান ডেভেলপম্যান্ট ও কোচবিহার মাউন্টেনিয়ার্স ক্লাব সহযোগিতাকরেন। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা ও বিভিন্ন তথ্য সহ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিজ্ঞান কর্মী জয়দেব দে ও শিক্ষক অমিতাভ চক্রবর্ত্তী।

—নিজস্ব সংবাদদাতা

রিপোর্টঃ

চাকদহে নাট্যোৎসব

নাট্যকার বাদল সরকারের স্মৃতিতে চাকদহ উত্তর ঘোষপাড়া 'অবক্ষয়' এবং চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থার যৌথ উদ্যোগে ৭ ও ৮ জানুয়ারী চাকদহের শ্যামাপ্রসাদ ময়দানে ২টি মনোরম সন্ধ্যা অর্পিত হয়। ২ দিনের নাট্যোৎসবে ঝালাপালার উদ্যোগে 'দুষ্টু বাঘ', শতাব্দীর উদ্যোগে 'চড়ুইভাতি', আয়নার 'লাপিস লাজুলি', অন্য মনের প্রযোজনায় 'গাধা বাজার' মঞ্চস্থ হয়। অনুষ্ঠানে প্রদর্শিত হয় বাদল সরকারের নাট্যোকৃতি বিষয়ক একটি প্রদর্শনী। চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থার উদ্যোগে কুসংস্কার বিরোধী একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিজ্ঞান বিষয়ক পত্র পত্রিকা সহ একটি স্টলেরও আয়োজন করা হয়।

হিজলী বাদাম

ANACARDIUM OCCIDENTALE Linn. Anacardiaceae চিঃবঃ ৯/৩৪, BP 354 Dasfur 19 ED.A 1014, FBI II 20, FI II 312 dt. 17. KC6.66.68

অন্যনামে ঃ বাংলা, হিজলী বাদাম/কাজুবাদাম, গুজরাতি, হিন্দি, মারাঠী, পঞ্জাবী, কাজু, কপুড় -গোদাম্বি মালয়লম - পারাংকিমাওয়া, ওড়িয়া-লঙ্কা বাদাম, তামিল-মুন্তিরী, তেলুগু -জিড়িখামিড়ি।

নামকরণ জন্মস্থান ও বিস্তার

দক্ষিণ আমেরিকা কাজু বাদামের উৎপত্তি স্থান। প্রায় ৪ শতাব্দী আগে পর্তুগিজ নাবিকগণ ব্রাজিল থেকে একে গোয়াতে নিয়ে আসেন। ব্রাজিলের প্রাচীন ভাষায় এ্যাকাজু (ACAJU)। সম্ভবত পর্তুগিজরা ভারতের পশ্চিম উপকূলে প্রথম এর চাষ শুরু করেন। তখনই তারা কাজু নামকরণ করেন। তারপর এর ফ্রেঞ্চ নাম হয় ক্যাসিও। বর্তমানে দক্ষিণ ভারতের সমুদ্র উপকূল অঞ্চল, মধ্যভারত, উড়িষ্যা প্রভৃতি স্থানে বিস্তার লাভ করে। বাংলায় সমুদ্র উপকুলবর্তী বালুময় হিজলী অঞ্চলে হয়ত এটিকে প্রথম লাগানো হয় তাই একে হিজলী বাদাম বলে।

পরিচিতি

চিরহরিৎ ৬-১২ মিটার উঁচু গাছটির গুড়ি খাটো বাঁকা ও অসরল। বাকল ফাটা ফাটা হয়। ছাল কাটলে হলদে হলদে আঠা বের হয়। পাতা ৪ থেকে ১০ সেন্টিমিটার লম্বা ও ৭-১২ সেমি চওড়া এবং পুরু হয়। শক্ত চামড়ার মত।। আগা কখনও খাজকাটা; প্রায় ১০ জোড়া শিরা থাকে। বোঁটা ০.৬-১.৩ সেমি। পুষ্পমুকুল ১৫-২৫ সেমি, রোমশ মঞ্জরীপত্র ভল্লাকার, উভয় পাশ উত্তল; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রোমাবৃত।

ফুল গুচ্ছাকার ১-২ সেমি ব্যাসযুক্ত। নীলভলাল দাগযুক্ত হলদে রঙের ফুল বৃতি ৫ অংশযুক্ত ০.৪-০.৫ সেমি। পাপড়ি রৈখিক ৫টি, ০.৮-১.২৫ সেমি। পুংকেশর ৭টি, কখনও কখনও ৭টি। ১ সেমি লম্বা, একটি অন্যদের চেয়ে বড় থাকে। ফল ৫-৮ সেমি লম্বা নাশপাতির মত মাংসল। পুষ্পাধারের মাথায় ২-৩.৫ সেমি লম্বা বৃক্কের মত চেহারার ফল থাকে।

পুনরাবর্তন

ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাসে গাছে গুচ্ছাকারে লালচে দাগযুক্ত পীত রঙের ফুল গাছ। শুরু হয় এবং মার্চল এপিল মাসে ফল পাকা শুরু হয় এবং মে জুন মাস নাগাদ শেষ হয়।

বংশবিস্তার

ডিসেম্বর মাস থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত গাছে ফুল হতে দেখা যায় এবং মার্চ মাস থেকে জুন মাসের মধ্যেই ফল পাকে। বীজ ১ কিলোগ্রামে ১৬৩ টারমত। পরিপক্ক ফল গাছ থেকে পড়লে কুড়িয়ে নিয়ে এসে ফল থেকে বীজ আলাদা করতে হয়। বপনের প্রথম সপ্তাহে অঙ্কুরোদগম শুরু হলেও কাজটি শেষ হতে প্রায় সপ্তাহ সাতেক সময় নেয়। শতকরা ৭০ ভাগের মত বীজ থেকে অঙ্কুরোদগম হয়। এছাড়া এক বছরের পুরাতন চারা কিম্বা তার 'স্টামা' করে রোপবনে লাগানো যেতে পারে। তবে যেহেতু বীজ থেকে উৎপন্ন চারা ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় তাই প্রত্যক্ষভাবে বপনের ওপর বেশী জোড় দেওয়া হয়। যে সমস্ত জায়গায় চারা গজায় না শুধু সেখানেই চারা কিংবা 'স্টাম্প' রোপন করা হয়ে থাকে।

ব্যবহারিতা

সারা পৃথিবীতেই বৃক্কের আকৃতি বিশিষ্ট ফল বা কাজু বাদামের প্রচুর চাহিদা এবং এর দামও ভাল পাওয়া যায়। মাংসল কমলা-লাল নাশপাতির মত আপেল থেকে এক রকম রস পাওয়া যায় তাতে ভিটামিন 'সি' এবং মদ্য থাকে। এই মদ্য থেকে তৈরী 'ফেণী' নামক মদ তৈরী করা হয় গোয়াতে। উপকূল অঞ্চলে বালিয়ারী পুনরুদ্ধারে এই গাছ সাহায্য করে। এছাড়া এর কাঠ দিয়ে নানা রকম আসবাবপত্র বানানো যেতেই পারে তবে সেটা গৌণ।

ঔষধিমূল্য

বীজের শক্ত আবরণ থেকে গাঢ় বাদামী রঙের চটচটে এক প্রকার তেল পাওয়া যায়। অতিশয় কটু ক্ষারীয় এই তেলের নাম 'কার্ডোল'। এই তেল চামড়াতে লাগালে ফোস্কা পরে তবে জড়ুল, পায়ের কড়া এবং দূষিত ক্ষতের চিকিৎসায় একে ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়াও এই গাছের ছাল, মূল, ফল ও বীজের শাঁস এর ব্যবহার রয়েছে হৃদ্দৌর্বল্য, ইন্দ্রিদৌর্বল্যে মস্তিষ্কের দৌর্বল্যে এবং অপুষ্ঠির ক্ষেত্রে।

লেখক ঃ শ্রী প্রনবেশ কুমার চৌধুরী, আলিপুরদুয়ার নেচার ক্লাব, জলপাইগুড়ি, ফোন-০৩৫৬৪২৫৫৬৫০, মোঃ-৯৯৩২৮৯১৯০৪

সূত্র নির্দেশ ঃ— ১। চিরঞ্জীব বনৌষধি - আকুর্বেদাচার্য্য শিবকালী ভট্টাচার্য্য

২। BengalPlants - David Prain

৩। Medicinal Plants of India Pakistan - J.F. Dasfur

৪। A Drdionory of Economic products of India - Sir George Watt.

৫। Flora of British India-J.D.Hooker.

৬। Flora Indica-William Roxfurgh.

৭। The book of Indian Trees-K.C. Sahni.

জাঙ্ক ফুড প্রসঙ্গে

১ পাতার পর

কমপ্লেক্স ও সি ভিটামিন, ক্যালসিয়াম বা লৌহের অভাব দেখা যায়। কোনকোনটিতে রিফাইন্ড বা পরিমর্জিত কার্বহাইড্রেট বা চিনি বা স্নেহ পদার্থের আধিক্য দেখা যায়।

'জাঙ্ক' এই ইংরাজী শব্দটির আভিধানিক অর্থ মূল্যহীন বা স্বল্পমূল্যের বস্তু অর্থাৎ 'অফ লিটিল অর নো ভ্যালু'। আর ফাস্ট ফুড বা চটজলদী খাবার তাকেও এই গোত্রেই ফেলা হয়। পৃথিবীতে ফাস্ট ফুড ইনডাস্ট্রি আজ দ্রুত হারে বেড়ে চলেছে। সেই সঙ্গে তাল মিলিয়ে মানুষের খাদ্যাভ্যাসও বদলে যাচ্ছে। পাঁচ থেকে পঞ্চান্ন সকলকেই এই খাবার আকৃষ্ট করছে। আরও ছোট ছেলেমেয়েরাও এই সব লবন যুক্ত নানান রকমের চিপস্, আইসক্রীম, চকোলেট ও নরম পানীয়ের ভক্ত হয়ে পড়ছে এবং এতে আসক্তিও বাড়ছে।

নানা পরীক্ষা নিরীক্ষায় দেখা গেছে অতিরিক্ত চিনি স্নেহ পদার্থ যুক্ত খাবার একধরণের আসক্তি তৈরী করে। প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নায়ু বিজ্ঞানের অধ্যাপক ডঃ এইচ.জি হোবেল গবেষণাগারে দেখেছেন অতিরিক্ত চিনিযুক্ত খাবার দীর্ঘদিন ইঁদুরদের খাওয়ালে আসক্তি তৈরী হয়। পরে ঐ খাবার প্রত্যাহার করে নিয়ে স্বাভাবিক খাবার দিলে তাদের মধ্যে অস্থিরতা দেয়। ঠিক এই একই ভাবে উইজকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নায়ু রোগ বিশেষজ্ঞ ডঃ অ্যানিকেলী ইঁদুরদের বেশ কিছুদিন অতিরিক্ত স্নেহ পদার্থ যুক্ত খাবার খাইয়ে দেখেছেন এদের মস্তিষ্কে এক ধরণের রাসায়নিক পরিবর্তন হয়। এদের মস্তিষ্কের ওপি অয়েড, লেপটিন নামক একটি যৌগের নিঃসরণ বন্ধ করে দেয়। লেপটিন মস্তিষ্কের সন্তুষ্টি কেন্দ্র থেকে নিঃসৃত হয়ে খাদ্যগ্রহণের ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। কিন্তু লেপটিনের অভাবে খাদ্য গ্রহণ চলতেই থাকে ক্ষুধার প্রশমন হয় না। ফলে স্থুলত্ব দেখা দেয়। অতিরিক্ত ভাজাভুজি, তেল সম্পৃক্ত খাবার শুধু মস্তিষ্কের নেপটিন নিঃসরণ বন্ধই করে না, উল্টে মস্তিষ্ক কোষ থেকে গ্যালেনিন নামক একটি পলিপেপটাইডের নিঃসরণ, ক্ষুধাকে আরও বাড়িয়ে তোলে। তার উপর শক্তি খরচ করার প্রবণতাকে কমিয়ে দেয়। ফলে স্থুলত্ব আরও বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সম্প্রতি ইউরোপীয়ান এ্যাসোসিয়েশন ফর দি স্টাডি অফ ওবেসিটি নামক সংস্থার মুখপাত্র ডঃ পিটার কোপেনম্যান বলেছেন 'উন্নয়নশীল দেশগুলিতে অতিভোজন আর অতি ওজনের প্রবনতা দেখা দিয়েছে। যা হয়ত মহামারীর আকার ধারণ করতে পারে।' আর এই অতিওজন ডেকে আনতে পারে ডায়াবেটিস, উচ্চরক্তচাপ, হৃৎপিন্ড ও রক্তাবহানালীর অসুখ, মেয়েদের স্তনের ক্যানসার ইত্যাদি।

ইদানিং শিশুদের জন্য প্রস্তুত আহারে ও কৃত্রিম গন্ধ,বর্ণ, খাদ্য সংরক্ষক ও খাদ্য সংযোজক দেওয়ার প্রবনতা দেখা দিয়েছে। বিজ্ঞাপনের চটকে স্বাভাবিক আহারের পরিবর্তে সম্পূর্ণরূপে এই খাবারগুলির উপর নির্ভরতা বেড়ে যাচ্ছে। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিশু বিশেষজ্ঞ ডঃ ফেনগোল্ড লক্ষ্য করেছেন এর ফলে শিশুদের মধ্যে মনোযোগের অভাব ও অতিরিক্ত ইত্তেজনা প্রবনতা দেখা দেয়। যেটিকে Attention Deficit Hyperactivity Disorder Syndrome নামে অভিহিত করেছেন।

জাঙ্ক ফুডগুলিতে তন্তু বা ফাইবারের একান্ত অভাব। বেশীর ভাগই হল রিফাইন্ড বা পরিমার্জিত খাদ্য উপাদান দিয়ে তৈরী। যা অতিরিক্ত গ্রহণের ফলে কোষ্ঠ কাঠিন্য ও পরবর্তীকালে রক্তে কোলেস্টারলের আধিক্য, অ্যাপেনডিসাইটিস, গলস্টোন, কোলনে ডাইভার্টিকুলোসিস ও কোলন ক্যানসারের সম্ভবনাকে বাড়িতে তুলতে পারে। সল্টেড় চিপস্, বাদাম, সস ইত্যাদি খাওয়ার প্রবনতা থাকলে প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত লবন গ্রহণের কুফল দেখা দেয়। আবহাওয়া জনিত কারণে ভারতের অনেক অঞ্চলের মানুষই বেশী লবন খান। লবন যা সোডিয়াম ক্লোরাইড় দেহের পক্ষে একটি প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ ধাতব পদার্থ। কিন্তু অতিরিক্ত গ্রহণের ফলে পাকস্থলীর প্রদাহ, অস্থি থেকে অতিরিক্ত ক্যালসিয়ামে মোক্ষন হতে থাকে ফলে অস্থি নরম ও ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। এছাড়া পাকস্থলীর প্রদাহ ও ক্যানসার ঘটাতে পারে। তাই লবন যুক্ত আলু বা অন্যান্য ভাজা বা বিস্কুট পাঁপড়, চাটনী সস বা আচার নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় খাওয়া উচিত।

জর্জিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি বিজ্ঞানীর অধ্যাপক ডাঃ সি.ডি. বার্ডানিয়ার জনসমীক্ষা পর্যালোচনা করে ও গবেষণাগারে পরীক্ষা করে দেখেছেন যে খাদ্যে স্নেহ পদার্থের অনুপাত বাড়লে অথবা জটিল শর্করার বদলে সরল শর্করার পরিমাণের বৃদ্ধি ঘটলে হৃৎপিন্ড ও রক্তরহা নালীর অসুখে মৃত্যুর হারও আণুপাতিক হারে বেড়ে যায়।

যাইহোক, জাঙ্ক ফুড বা ফাস্ট ফুড এদের যে নামেই ডাকা হোক না কেন এগুলি মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের নাগালের মধ্যে। ছোট বড় কেউই এর আকর্ষণ এড়াতে পারছে না। তাই এগুলির মধ্যে টাটকা সব্জী, ফল দুধ বা দই সংযোজিত হলে, তেল, চিনি ও লবনের মাত্রা কমিয়ে সার্বিক পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখলে তা সুষম খাবারের কাছাকাছি হয়ে উঠবে নয়ত আজকের আনন্দ ভবিষ্যতের নিরানন্দের কারণ হবে। আর আমাদের জীবনে জাঙ্ক ফুডের অবশ্যম্ভাবিতা ও জাঙ্ক ফুড সাবধানতার কথা মনে করিয়ে দিতে ও সচেতন করতেই ২১শে জুলাই জাতীয় জাঙ্ক ফুড দিবস পালন করা হয়।

লেখক ঃ-ডঃ ইরা ঘোষ
৫/১, পূর্বাচল ক্যানেল সাউথ রোড়, পোঃ হাল্টু, কলকাতা-৭৮
ফোন ঃ-(০৩৩) ২৪৮৪২৮৯৭ / মোঃ-৯৭৪৮১০১২৯১

জলাভূমি প্রকৃতির কিডনি

জলাশয়কে রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের সকলের। ২০০১ সালে আগষ্ট মাসে সুপ্রিম কোর্ট জানায় পুকুর বা জলাশয় ভরাট করা যাবে না। জলাশয় সংরক্ষণে ৯টি আইন রাজ্যের হাতে রয়েছে, অথচ সর্বত্র বিপন্ন জলাশয়।

—বিজ্ঞান অন্বেষক

রহস্যময় কৃষ্ণপদার্থ

'বিপুল এ পৃথিবীর কতটুকু জানি?' কবির এই আক্ষেপ যথার্থই সত্যি। এ বিশ্বচরাচরের হাঁড়ির খবর অধিকাংশই এখনো অজানা। পৃথিবী ছাড়িয়ে মহাবিশ্বের কথা ভাবলে তো কথাই নেই। গ্রহ, নক্ষত্র, ছায়াপথ এসব মহাজাগতিক বস্তু নিয়েই এ মহাবিশ্ব। কিভাবে সৃষ্টি হল এসব মহাজাগতিক বস্তুর মান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তাই নিয়েই গড়ে উঠেছে 'সৃষ্টিতত্ত্ব' বা কসমোলজি নামে জ্যোতিবিজ্ঞানের শাখা। নিরন্তর গবেষণা চলছে সৃষ্টির রহস্য সমাধানে।

বিজ্ঞানীদের হিসাবে এই মহাবিশ্বের দৃশ্যমান উপাদানগুলো গ্রহ, নক্ষত্র, ছায়াপথ ইত্যাদি মহাবিশ্বের মোট আয়তনের তুলনায় এক নগন্য স্থান আবিষ্কার করে রয়েছে। মাত্র প্রায় পাঁচ শতাংশের মত। পঁচিশ শতাংশের মত রয়েছে কৃষ্ণ পদার্থ এবং বাকি প্রায় সত্তর শতাংশ আবার শক্তিতে ভরা। কৃষ্ণ পদার্থ এক রহস্যময় অস্তিত্ব যা এখনও মানুষের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। জ্যোর্তিবিজ্ঞান বা কণা পদার্থ বিজ্ঞানে এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রও এদের ধরতে সক্ষম। তাহলে কৃষ্ণ পদার্থের ধারণা এল কিভাবে? কার্যকারণ সম্পর্ক এবং মানুষের মস্তিষ্কেই এই সাফল্যের চাবিকাঠি।

সেটা ১৯৩৩ সাল। ক্যালিফোর্ণিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির জ্যোর্তিবিদ ফ্রিজ জিকি দূরের কিছু ছায়াপথে লক্ষ্য করলেন অস্বাভাবিক কিছু আচরন। সৃষ্টিতত্ত্বে প্রচলিত বিগ ব্যাং তত্ত্বানুসারে এই মহাবিশ্ব ক্রমপ্রসারমান। সৃষ্টির শুরু থেকে আজ অবধি ছায়াপথগুলো ছুটে চলেছে পরস্পর থেকে দূরে আরও দূরে। কিন্তু এক্ষেত্রে নিয়মের যেন কিছুটা ব্যতিক্রম ঘটে যাচ্ছে। ছায়াপথগুলো যেন তীব্র কোন মহাকর্ষ বলের প্রভাবে ঘন সন্নিবেশিত রয়েছে। এ থেকে তার মনে হল অবশ্যই তীব্র মহাকর্ষ বলের কোন উৎস ঘিরে রেখেছে ছায়াপথগুলোকে। ক্রমে ক্রমে বিষয়টি পরিষ্কার হল জ্যোর্তিবিদদের কাছে। মনে করা হল বিশাল পরিমান অদৃশ্য পদার্থ ছায়াপথকে ঘিরে রেখে সৃষ্টি করছে সেই মহাকর্ষ বল। অদৃশ্য এই পদার্থই হল কৃষ্ণ পদার্থ।

কৃষ্ণ পদার্থের উপাদান কি? বিষয়টি জ্যোর্তির্বিদদের কাছে এক ধোঁয়াশা। বিভিন্ন তত্ত্ব খাড়া করে বিষয়টির একটি সুষ্ঠ সমাধানের চেষ্টা করে যাচ্ছেন তাঁরা। এ সম্পর্কে প্রথম যে ব্যাখ্যাটি দেওয়া হল তা হল কৃষ্ণ গহ্বরকে পাথেয় করে। কৃষ্ণ গহ্বর হল এমন এক মহাজাগতিক অস্তিত্ব যার আর্কষনী ক্ষমতা প্রবল। কোন বস্তু এমন কি আলোও যার আকর্ষনের থাবা এড়াতে পারে না। এতই তীব্র এদের মহাকর্ষ বল। কিন্তু কৃষ্ণ পদার্থ সংক্রান্ত কৃষ্ণ গহ্বর তত্ত্ব তেমন জুত সই হল না। তাই প্রত্যাখাত হল তা। বরং বলা হল কৃষ্ণ পদার্থের উপাদান হতে পারে রহস্যময় নিউট্রিনো কণা। নিউট্রিনো হল এমন এক ধরণের মৌল কণা যা ভরহীন এবং আধান বিহীন। ছোটে প্রায় আলোর সমান গতিবেগে। সাধারণ বস্তু সমূহের সঙ্গে তেমন কোন প্রতিক্রিয়াও নেই। তাই সর্বদাই যেন পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। ধরা খুবই শক্ত। কানাডায় পদার্থবিদ জন সিম্পসন ১৮৮৫ সালে কৃষ্ণ পদার্থের উপাদান হিসাবে প্রথম ধারণা দেন এহেন নিউট্রিনো কণার। যদিও তেমন সাফল্য পায়নি নিউট্রিনো তত্ত্ব।

কৃষ্ণ পদার্থের রহস্য সমাধানে পরবর্তী যে অধ্যায়টি সংযোজিত হল তা হল ম্যাসিভ কমপ্যাক্ট হেলোস অবজেক্ট বা ম্যাকোস সংক্রান্ত। ম্যাকোস হল আবছা লাল বামন নক্ষত্র যা কৃষ্ণ পদার্থের উপাদান হতে পারে বলে মনে করা হল। কিন্তু যে ধারণাও আমল পায়নি। ১৯৯৫ সালে ইনস্টিটিউট অফ অ্যাডভান্সড স্টাডি (প্রিন্সটন) এর জন বাহকল এর নেতৃত্বে একদল বিজ্ঞানী হাবল্ স্পেস টেলিস্কোপ এর পর্যবেক্ষণ লব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে ম্যাকোসের ধারণা নস্যাৎ করে দেন। তাদের মতে, ম্যাকোসের মত অত ছোট নক্ষত্রের অস্তিত্ব সম্ভব নয় কারণ নক্ষত্র সৃষ্টিতে যে ন্যূনতম ভরের প্রয়োজন, ম্যাকোসের তা নেই। তাই ম্যাকোসও কৃষ্ণ পদার্থের রহস্য সমাধানে সাড়া ফেলতে পারিনি।

কৃষ্ণ পদার্থের স্বরূপ উদঘাটনে সর্বশেষ সংযোজন হল উইকলি ইন্টায়েকটির ম্যাসিভ পার্টিকেলস্ বা উইম্পস কণা। সর্বত্র বিরাজমান এরূপ কণার সন্ধান চলছে খনিগর্ভে। সামান্য সফলও হয়েছেন বিজ্ঞানীরা। পুরোপুরি সফল হলে কৃষ্ণ পদার্থের রহস্য সমাধান যেমন হবে তেমনি ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হবে পদার্থ বিজ্ঞানের কিছু মৌলিক বিষয়েরও।

লেখক ঃ রতন দেবনাথ

ফোন ঃ- ০৩৩-২৫৮২৩৬৭০

জৈব ঘড়ি, জৈব কম্পাস এবং আমরা

4 পাতার পর

কখনো তাকে সন্ধ্যের আকাশে দেখি আবার কখনো বা শেষ রাতের আকাশে। নভেম্বর ডিসেম্বর মাসে রাত আটটা-ন'টার সময় পূর্বদিকে মুখ করে মাথা সোজা রেখে চোখের ভুরু বরাবর আকাশের দিকে তাকালে কালপুরুষ নক্ষত্রগুলিকে শুয়ে থাকতে দেখি। ধ্রুবতারা উত্তরদিক নির্দেশ করে এটা সবারই জানা। ছোট কীটপতঙ্গ থেকে শুরু করে পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো প্রাণী নীল তিমি পর্যন্ত আকাশের এই আলোকসজ্জাকে লক্ষ্য করে পরিক্রমণ করে। কারো পরিক্রমণ পথ পনেরো ফুট আর কারো পনেরো হাজার কিমি। আকাশের জ্যোতিষ্কমন্ডলীর বিন্যাস ছাড়াও আঞ্চলিক কিছু বিষয়ও দিক নির্ণয়ে সহায়ক হয়। শহর থেকে অনেক দূরে কোন গ্রামের রাতের আকাশের একপ্রান্তের আলোর আভাস জানান দেয় যে সেদিক শহর রয়েছে।

প্রকৃতি প্রদত্ত জৈবঘড়ি এবং জৈব কম্পাস সঠিক অনুশীলন এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে 'পূর্ণব্যবহারযোগ্য' করে আমরা আমাদের যন্ত্র নির্ভরতা কমাতে পারি। অথবা আমাদের দৈনন্দিন কাজগুলোকে সঠিক সময়ে করতে পারি।

লেখক ঃ-শংকর নারায়ণ দাস,

কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম

ফোন ঃ-৯৬০৯৭৪২৯৯৭

ড. দেবীপ্রসাদ দোয়ারীর মহাকাশ বক্তৃতা ঃ

সংকলক রামজীবন ভৌমিক
মো ঃ-৯৯৩৩১৮৮০৫৪

ড. দেবী প্রসাদ দোয়ারী কোচবিহার রবীন্দ্র ভবন প্রেক্ষাগৃহে সৌর জগতের নতুন রূপ ও তার ভবিষৎ শীর্ষক এক আলোচনা মঞ্চে মহাকাশ নিয়ে হৃদয় স্পর্শী বক্তব্য রাখেন। প্রোজেক্টরের মাধ্যমে মহাকাশের ছয় দুষ্প্রাপ্য ছবি এবং সাম্প্রতিক নাসা-র তোলা ছবি দেখিয়ে বক্তারা প্রাণ সঞ্চার করেন। প্রথমে মহাকাশ বিজ্ঞানের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে ছবি সহ সহজ ব্যাখ্যা দেন। মাঝে নক্ষত্রের জন্ম ও শেষে নক্ষত্রের মূলত সূর্যের মৃত্যু ও প্রাণ সৃষ্টির রহস্য উন্মোচন করেন।

মহাকাশ সম্পর্কিত দু-একটি মৌলিক বিষয় ছুঁয়ে নক্ষত্রের মৃত্যু মূলত সূর্য এবং প্রাণ সৃষ্টি নিয়ে তাঁর বক্তব্য তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

রাশি কি ?

রাশি আসলে কৌনিক পরিসর মাত্র। আকাশ পথে সূর্যের চলাচলের কাল্পনিক পথ। যাকে রবি মার্গ বা ক্রান্তিবৃত্ত বলে। সেটা মহাকাশে ৩৬০ ডিগ্রী কোণের একটি BELT তৈরী করে। একেই মোটামুটি ১২টি গড় ভাগে ভাগ করে ৩০ ডিগ্রী কৌনিক পরিসর পাওয়া যায়, যাকে ১২টি রাশি বলে বোঝানো হয়। এই কৌনিক পরিসর কোন ভাবেই ব্যক্তি মানুষের ভাগ্যের সাথে সম্পর্কিত নয়। ফলত অ্যাস্ট্রোলজি একটি বিদ্যা হতে পারে কিন্তু সেটা অবশ্যই ভ্রান্ত বিদ্যা। তার কোনদিনই বৈজ্ঞানিক বাস্তব ভিত্তি ছিল না আজও নেই। এটা লোক ঠকানোর ব্যবসা বা যেচে ঠকার ভীরুতা ছাড়া আর কিছু নয়।

সৌর জগতের অংশীদার কি শুধুই গ্রহ ও উপগ্রহরা ? 'না'—গ্রহ উপগ্রহের সাথে এই সৌর জগতে ঘুরে বেরাচ্ছে অসংখ্য ধূমকেতু বা কমেটস ও হাজার হাজার গ্রহাণুপুঞ্জ। এদের একটির সঙ্গে পৃথিবীর সংঘাত অসম্ভব কিছু নয়। ডঃ দোয়াবীর মতে 'পৃথিবীর অস্তিত্ব ও মানুষের বাঁচা দুটোই আকস্মিক ঘটনা। পৃথিবীর মেরু প্রদেশে আশ্চর্য মেরু প্রভা দেখা যায়। কারণ সূর্যের আহিত কণা স্রোত আকারে পৃথিবীর মেরু প্রদেশের দিকে ধেঁয়ে আসে এবং এক আশ্চর্য্য মেরু প্রভা তৈরি করে।

সূর্যের মৃত্যু ও প্রাণ রহস্য

'জন্মিলে মরিতে হয়' তারারাও মৃত্যু বরণ করে। কিভাবে ? তারারা বাঁচে কারণ তাদের ভেতরে শক্তির উৎপাদন হচ্ছে বলে। যেদিন তারাদের অন্দর মহলের শক্তি রূপান্তর প্রক্রিয়া শেষ হবে সেদিন তারা রাও মরে যাবে। তারাদের শেষ কি ভাবে হবে তা নির্ভর করে তারাদের প্রারম্ভিক ভর কিরূপ তার উপর। যে সকল তারাদের প্রারম্ভিক ভর সূর্যের এক থেকে আট গুনের মধ্যে—সূর্যের কথাই ধরা যাক — সূর্যের অভ্যন্তরে ফিউশন নিউক্লিয়াঁর রিএ্যাকশন এর ফলে অনবরত হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম রূপান্তর চলছে। প্রভূত শক্তি নির্গত হচ্ছে। এই শক্তি সূর্য কেন্দ্র থেকে পরিধির দিকে বেরিয়ে আসার সময় কেন্দ্রাতিগ বলের সৃষ্টি করছে। কেন্দ্রাতিগ বল সূর্যের কেন্দ্রাভিমুখী স্বঅভিকর্ষজ বলের সমান হচ্ছে। ফলত সূর্য তার আকার ধরে রাখছে। বিজ্ঞানীরা হিসেব কষে দেখিয়েছেন সূর্যের অভ্যন্তরে যে পরিমাণ হাইড্রোজেন রয়েছে সেটা পুরোপুরি হিলিয়ামে রূপান্তরিত হতে সময় লাগবে প্রায় ৫০০ কোটি বছর। ৫০০ কোটি বছর পর যখন সমস্ত হাইড্রোজেন জ্বালানি হিলিয়ামে পরিণত হবে তখন সূর্যের কোর বা ভেতর অংশ শক্তি উৎপাদন বন্ধ করে দেবে। এই সময় থেকেই শুরু হবে অন্য এক যাত্রার। শক্তি বিকিরণজনিত কেন্দ্রাতিগ বন্ধ হয়ে যাবে। কেন্দ্রাতিগ চাপ ও থাকবে না। তখন সূর্যের স্বঅভিকর্ষজ বল জনিত চাপের ফলে সূর্য ছোট হতে থাকবে। সূর্য যত ছোট হতে থাকবে তত সূর্যের ভেতরে চাপ বাড়তে থাকবে। চাপ বৃদ্ধি সূর্যের ভেতরে অনেক তাপের সৃষ্টি করবে। অপর দিকে সূর্যের বাইরের দিকে খোলসের মত এলাকায় যে পরিমাণ হাইড্রোজেন ছিল সেটাও সংকুচিত হতে থাকবে স্বঅভিকর্ষজ বলের টানে। সংকুচিত হতে হতে প্রবল চাপ বৃদ্ধি ও তাপ বৃদ্ধি ঘটবে। তাপ বৃদ্ধি এতটা ঘটবে যে, সূর্য খোলসের হাইড্রোজেন স্তরের তাপমাত্রা হবে ১.৫ কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই অভাবনীয় তাপ বৃদ্ধিতে সূর্য খোলসের হাইড্রোজেন এর আয়তন দৈত্যাকারে ফুলে ফেঁপে প্রসারিত হতে থাকবে। সূর্যের এই প্রসার কোথায় গিয়ে থামবে ? বিজ্ঞানীরা অংক কষে দেখিয়েছেন ১.৫ কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার সূর্য খোলস প্রসারিত হতে হতে প্রায় পৃথিবীর কক্ষপথ ছুয়ে ফেলবে। আজ থেকে ৫০০ কোটি বছর পর বুধ, শুক্র পৃথিবী গ্রহের আলাদা কোন অস্তিত্ব থাকবে না। আমরা সবাই সূর্যের মধ্যে ঢুকে যাবো। কিন্তু চিন্তা নেই। ৫০০ কোটি বছর আমরা আমাদের বাঁচিয়ে রাখি আগে ? উত্তপ্ত প্রসারিত লাল সূর্য খোলস সহ সূর্যকে তখন বলা হবে রেড গ্লান্ট বা লাল দৈত্য। কিন্তু সূর্যের কেন্দ্রের কি অবস্থা ? সূর্যের ভেতরটার মধ্যে শক্তি উৎপাদন বন্ধ ফলে স্বঅভিকর্ষজ বল কাটানো যাচ্ছে না। সূর্যের ভেতরটা ছোট হতে থাকায় সূর্য কেন্দ্রে প্রবল চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে ফলত তাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কেন্দ্রীয় হিলিয়াম গোলায় তাপমাত্রা বাড়তে বাড়তে ১.৫ কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে বেড়ে ১০ কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছবে। তখন হিলিয়াম থেকে কার্বন রূপান্তর শুরু হবে। তিনটি হিলিয়াম পরমানুর কেন্দ্র জুড়ে গিয়ে তৈরি হবেএকটি কার্বন পরমানুর নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রক। যতক্ষন না পূর্ণ হিলিয়াম পরমাণুগুলি কার্বন পরমাণুতে পরিবর্তিত হয়। এই রূপান্তর পর্বেও সূর্য কেন্দ্রে প্রচুর তাপ তৈরি হবে। সূর্যের কেন্দ্রের তাপমাত্রা প্রভূত পরিমাণ বেড়ে যাবে। কিন্তু যে সকল তারাদের প্রারম্ভিক ভর-সূর্যের এক থেকে আট গুনের মধ্যে থাকে তাদের ভর এতটা নয়

ড. দেবীপ্রসাদ দোয়ারী 10 পাতার পর

যে, নব সৃষ্ট কার্বন গোলার উপর প্রভূত চাপ সৃষ্টি করতে পারবে যাতে কার্বন গোলার তাপমাত্রা ১০ কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে বেড়ে ২০ কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌছতে পারে। কারণ ২০ কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াসে কার্বন পরমাণুর কেন্দ্র পরিবর্তিত হয়ে বা ফিউস করে তৈরি করে Oxygen (O_2) Sulphar (S) Argon (Ar) Neon (Ne) প্রভৃতি। তার ফলে সূর্যাভ্যন্তরে একটি অত্যন্ত উজ্জ্বল অত্যন্ত উত্তপ্ত কার্বন গোলা তৈরি হবে। এত উত্তপ্ত যে আকাশে একটি উজ্জ্বল চক্চকে পিন্ড দেখা যাবে।

কিন্তু বাইরেটা অর্থাৎ গ্যাসীয় উত্তপ্ত খোলসটা বড় হতে হতে এত বড় হয়ে যাবে যে আস্তে আস্তে ভারী চক্চকে ভেতর অংশটি ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। এই প্রসারিত খোলসটাই একটা মেঘের সৃষ্টি করবে। সেই মেঘটাকে বলা হবে প্লানেটারি নেবুলা। জন্মের সময় যেমন মেঘ থেকে তারাদের সৃষ্টি হয়ে ছিল তেমনি মৃত্যুর পরও তারা রা মেঘে রূপান্তরিত হয়। কোটি কোটি বছরের অত্যন্ত চাপে ও তাপে খয়েরি বামনের কার্বন গোলা, হীরকখন্ডে রূপান্তরিত হয়। যে ভাবে কয়লা খনিতে কয়লা অর্থাৎ কার্বন পরমাণু প্রবল চাপে ও তাপে হীরক (কার্বন রূপভেদ) খন্ডে রূপান্তরিত হয়েছে। গত ১৩ বছরে বিজ্ঞানীরা আকাশের বুকে 20 KM x 25 KM আকারের হীরের টুকরো ভেসে বেড়াতে দেখেছেন। Like A Diamond in the Sky। গত ২০ বছরে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখতে পেয়েছেন তারাদের মৃত্যুর সময় বাইরের খোলস যখন ছড়িয়ে পরে তখন প্রচন্ড তাপে ও চাপে সৃষ্টি হয় নিত্য নতুন যৌগিত অণু। ১৯৯৫ খ্রীঃ এরকমই প্রায় ৯২টি যৌগিক অণুর যৌগিক ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন তার মধ্যে ১৯৯৭ খ্রীঃ মধ্যেই ৪০টি অণু আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে। এদের মধ্যে বেশীর ভাগই জৈব অণু (মূলতঃ কার্বন ও হাইড্রোজেনের যৌগ)। যে কোন তারাই তার মৃত্যুর সময় সৃষ্টি করে এমন কাঁচা রসদ জার থেকেই প্রাণের সঞ্চার হওয়া সম্ভব। যারা মনে করে শুধুমাত্র পৃথিবীতেই প্রাণ আছে আর কোথাও নেই তার মত বোকা আর কেই হতে পারে না। Life is not particular to the earth, it is an universal process মহাবিশ্বে যেকোন আনাচে কানাচে যখন খুশি প্রাণের সৃষ্টি হতে পারে। তাই বর্তমানে নতুন গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্য বিষয় বা অ্যাকাডেমি বিষয় হতে চলেছে "LIFE IN UNIVERSE"।

আমাদের পৃথিবীতে প্রাণ এসেছে কোথা থেকে? এই ব্রহ্মান্ডে অন্য কোথাও কি প্রাণ সত্যিই আছে? সম্ভাব্যতার তত্ত্ব কি বলে? মহাবিশ্বে এক লক্ষ কোটি ছায়াপথ বা গ্যালাক্সী আবিষ্কৃত হয়েছে যার প্রতিষ্ঠিত ২০ হাজার কোটি তারা আছে। এত বড় অকল্পনীয় ছায়াপথ আর হাজার হাজার কোটি তারাদের দেশে শুধু প্রাণ আমাদের পৃথিবীতেই আছে এই বিশ্বাস সঠিক হতে পারে না। গত ৩০ বছরে জ্যোর্তিজীববিজ্ঞানী জ্যোর্তি পদার্থ বিজ্ঞানী, জ্যোর্তি রসায়ন বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে বুঝতে পেরেছেন পৃথিবীতে প্রাণের সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়। পৃথিবীতে প্রাণ বোধ হয় এসেছিল বহির্বিশ্ব থেকে। কোটি কোটি বরফের ধূমকেতুই পৃথিবীতে যখন আছড়ে পড়ে তখন উত্তপ্ত পৃথিবী নামক গ্রহের বৃহৎ গতির গর্তে জলের সম্ভার তৈরী করে। আর এই বরফ ধূমকেতুর পীঠে চড়েই নক্ষত্র মৃত্যুর সময় তৈরী হওয়া প্রাণ সৃষ্টি সহায়ক পদার্থ সমূহ যেমন ভিটামিনস্ মিনারেলস্ ও জৈব অণু যেমন অ্যামাইনো অ্যাসিড পৃথিবীতে সঞ্চিত হয়েছে। অ্যামাইনো অ্যাসিড, যা জুড়ে তৈরী হয় প্রোটিন এবং ডিএনএ (ডি অক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড) বা প্রাণের নীল নক্সা তার পৃথিবীতে যাত্রা বহির্বিশ্ব থেকে ধূমকেতুর পীঠে চড়েই।

আজ থেকে প্রায় ৫০০ কোটি বছর আগে কোন বৃহৎ নক্ষত্রের ছিটকে আসা উত্তপ্ত অংশ তাপ বিকিরন করে ঠান্ডা হয়েই তৈরি করেছিল আমাদের মন ভোলানো বাসস্থান 'পৃথিবী'। প্রথম ১০০ কোটি বছর পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টির কোন পরিবেশ ছিল না এবং উপাদানগুলিও সঠিক ভাবে ছিল না। এই সময়কে বলে আ-জোয়িক এরা (AZOIC ERA)। তারপর নক্ষত্রলোকের মৃত নক্ষত্রের সৃষ্ট মেঘের বর্ষণেই পাওয়া গেল প্রাণ উপাদান বা পুষ্টি উপাদান। তাই বলা যায় আমরা প্রত্যেক জীবনই নক্ষত্র উপাদানে তৈরি বা নক্ষত্র সন্তান।

সংকলন সহায়তা করেছেন— দেবনীল ঘোষ।

স্কুইড

অক্টোপাসের সমগোত্রীয় একপ্রকার ভয়ংকর প্রাণী সমুদ্রে বিচরণ করে। এর নাম স্কুইড। অক্টোপাসের মতো এরাও মোস্কা পর্বের এবং সেফালো প্রাডা বা শির:পদ শ্রেণির অন্তর্গত। মোলাস্কা বা কোমলদেহী পর্বের প্রাণীদের মধ্যে এরাই সবচেয়ে উন্নত শ্রেণির। সমুদ্রে প্রায় ৩০ প্রজাপতির স্কুইড আছে। সমুদ্রের জলের সমুদ্রের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন রকম স্কুইডের বাস। কেউ থাকে সমুদ্রের গভীর অন্ধকারে, কেউবা থাকে সেই সব অঞ্চলে যেখানে সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারে। সাধারণ স্কুইডের বিজ্ঞান সম্মত নাম ললিগো ফরবেসি আই *(Loligo forbesii)* স্কুইডের নলাকার দেহের অগ্রভাবে ১০টি কর্ষিকা আছে। স্কুইডের ৬টি কর্ষিকা গোলাপী আবরণ দিয়ে ঢাকা। স্কুইডের ৮টি কর্ষিকা অক্টোপাসের মত। বাকী ২টি কর্ষিকা দেহের তুলনায় অনেক বেশী লম্বা। যুদ্ধের সময় শত্রুকে পেঁচিয়ে ধরার উদ্দেশ্যে এই কর্ষিকা দুটো ব্যবহার করে। স্কুইডের দেহে ভেতরের কিছুটা অংশ জুড়ে শক্ত খোলক থাকে। স্কুইডের মস্তিষ্ক উন্নত শ্রেণীর, চোখ দুটি মানুষের মত ক্ষমতাশালী।

সিঙ্গাপুর, হংকং ও অন্যান্য সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে এটি উপাদেয় খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

— লেখক ঃ- শৈবাল কুমার গুহ, ফোন-(০৩৩) ২৫৫৬৩৯১০

বিজ্ঞান দরবারের ৩১ তম বর্ষপূর্তি

১০ ডিসেম্বর, ২০১১, কাঁচরাপাড়া ঃ— বিজ্ঞান দরবার সংস্থার ৩১তম বর্ষপূর্তি ও ৩৩ম পূর্ব ভারত বিজ্ঞান ক্লাব সম্মেলন ১০ ডিসেম্বর অ্যালবার্টস স্কুলে (বসন্তবাবু রোড, কাঁচরাপাড়া) সারাদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হল। পরিচয় পর্ব ও সাংগঠনিক কাজকর্ম নিয়ে আলাপ আলোচনার মধ্যে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।

৩১ তম বর্ষ পূর্তিতে বিজ্ঞান দরবারের পক্ষ থেকে একটি ফোল্ডার প্রকাশ করা হয়। ফোল্ডার প্রকাশ করে সম্পাদক সুরজিত দাস বলেন ১৯৮০ সাল থেকে সংস্থা বিজ্ঞান মনস্কতা প্রসারের কাজ ধারাবহিক ভাবে চালিয়ে আসছে। জন্মলগ্ন থেকে বর্তমান বছর পর্যন্ত ২৫টির বেশী পুস্তিকা/ ফোল্ডার প্রকাশ করেছেন। হিরোসিমা দিবস, বিশ্ব পরিবেশ পালন করা হয়। পাশাপাশি পরমাণুচুল্লির বিরুদ্ধে ১৯৮২ সাল থেকে প্রচার আন্দোলন, পথসভা, পুস্তিকা প্রকাশ করা হচ্ছে। ভোপাল গ্যাস বিপর্যয় এর সাম্প্রতিক কোর্টের রায়ের প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়া, ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ধারাবাহিক বিজ্ঞান মনস্কতা প্রসার কর্মসূচী, বিজ্ঞানমেলা সহ নানা কর্মসূচী। ধারাবাহিকভাবে বিজ্ঞান অন্বেষক পত্রিকা ২০০৩ সাল থেকে প্রকাশ করা হচ্ছে। মরনোত্তর চক্ষুদান ও দেহদান নিয়ে প্রচার আন্দোলন, কর্নিয়া সংগ্রহ করে হাসপাতালে পাঠানো, সাপের কামড়ে মৃত্যুর হার কমানোর লক্ষ্যে নানা কর্মসূচী, অলৌকিকতায় বিজ্ঞান কর্মসূচী।

৩৩ তম পূর্ব ভারত বিজ্ঞানক্লাব সম্মেলনে একটি বিজ্ঞান আন্দোলনের পুস্তিকা প্রকাশ করেন দীপক কুমার দাঁ। সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়, বিশিষ্ট আইনজীবি বিশ্বজিৎ মুখার্জী প্রমুখ।

আর্সেনিক বিষ ও আমরা আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক অমূল্য মন্ডল, বিবর্তন ভট্টাচার্য ও জয়দেব দে। সমীক্ষায় বিভিন্ন রিপোর্ট সহ নানা তথ্য নিয়ে আলোচনা করেন।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বিজ্ঞান দরবারের সভাপতি অধ্যাপক গোপাল কৃষ্ণ গাঙ্গুলি। সভাপতি সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে জানান আগামী দিনে যৌথভাবে বিজ্ঞান সংস্থাগুলিকে কাজে এগিয়ে আসতে হবে।

— জয়দেব দে

স্মরণের আলোয় আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু সম্পর্কে আমরা সবাই জানি। তিনি একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী। আমাদের স্কুল পাঠ্য সব বইতেই তাঁর বিজ্ঞান গবেষণার কথা লেখা আছে। তবে আমরা সঠিক তথ্য জানি তো? ছোটবেলা থেকেই আমরা পড়ে আসছি গাছের প্রাণ আবিষ্কার করেছেন জগদীশচন্দ্র, কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয়, আসলে গাছ যে সজীব বস্তু তা আগে থেকেই জানা ছিল। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র আবিষ্কার করলেন, যে গাছ অন্যান্য প্রাণীদের মতই বাইরের উত্তেজনায় সাড়া দেয়। অর্থাৎ গাছেরও প্রাণীদের মত স্নায়ুতন্ত্র রয়েছে। তাঁর সমকালে তাঁ এই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার বোঝার জন্য স্বদেশ ও বিদেশের বৈজ্ঞানিক সমাজ তৈরি ছিলেন না। তাই সঠিক ব্যাখ্যা হয়নি তাঁর আবিষ্কারের। বর্তমানে বিদেশের বিজ্ঞানী মহল তাঁর আবিষ্কারের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছে। তাঁর কাজের পথ ধরে এগিয়ে চলেছে 'প্ল্যান্ট ফিজিওলজি'র বর্তমানকালের গবেষণা। এদেশেও চলছে কর্মযজ্ঞ। কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে এখনও তিনি 'গাছের প্রাণ' এর আবিষ্কতা। কবে শোধরাব আমাদের ভুলটা?

পাঠ্য বই এর আর একটি প্রচার হল, তিনি 'বেতার' এর আবিষ্কর্তা কথাটা ঠিক। তবে বেতার এর আবিষ্কার শুধু নয়। জগদীশচন্দ্র আবিষ্কার করেছিলেন 'ক্ষুদ্র' তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ বা 'মাইক্রোওয়েভ' যার ওপর দাঁড়িয়ে আছে আজকের দিনের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা। অর্থাৎ আজকের দিনের মোবাইল ফোন, স্যাটেলাইট বা উপগ্রহ যোগাযোগ ব্যবস্থা (যার কল্যাণে আমরা বসার ঘরে বসে ১০০-২০০ টা চ্যানেলে বিশ্বদর্শন করি)। র‍্যাডার মাইক্রোওয়েভ ওভেন নামে রান্নার যন্ত্র, আরও কতকি আধুনিক যন্ত্রপাতি! কিন্তু আমরা কি তাঁর এই আবিষ্কার সম্পর্কে সচেতন? বোধ হয় না। মোবাইলের বিজ্ঞাপনে বড় হয়ে ওঠে দেশী-বিদেশী প্রস্তুতকারী কোম্পানীর নাম। আমাদের দেশের আমাদের ঘরের বিজ্ঞানী আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের নাম একবারও উল্লেখ হয় না কোথাও। আর কতদিন আমরা মেনে নেব এসব?

সম্প্রতি পার হয়ে গেল তাঁর ৭৫তম মৃত্যুদিন। গত ২৩শে নভেম্বর। বসু বিজ্ঞান মন্দির ও কলকাতার রামমোহন লাইব্রেরী ও ফ্রি রিডিং রুম-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত তাঁর স্মরণ সন্ধ্যায় এই কথাগুলিই ফিরে ফিরে আসছিল। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে তাঁর আবিষ্কার কাজে লাগছে সমগ্র মানবজাতির। তাঁর মূল্যায়ন সঠিক ভাবে না হলে তার দায় আমাদের সকলের। বাঙালী হিসেবে আমাদের ঋণ অবশ্যই বেশি।

— ড. শতাব্দী দাস, ৯৮৩৬৫৭২৯২১

যোগাযোগ—বিজ্ঞান দরবার, ৫৮৫, অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদনগর), পোঃ কাঁচরাপাড়া ৭৪৩১৪৫, উঃ ২৪ পঃ। ফোন ঃ ০৩৩-২৫৮০-৮৮১৬, ৯৪৭৪৩৩০০৯২।
সম্পাদক মন্ডলী—অভিজিৎ অধিকারী, বিবর্তন ভট্টাচার্য, বিজয় সরকার, সুরজিৎ দাস, তাপস মজুমদার, চন্দন সুরভি দাস, চন্দন রায়, কিঞ্জল বিশ্বাস।

স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদ নগর) পোঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পোঃ কাঁচরাপাড়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত।
অক্ষর বিন্যাস ঃ রিম্পা কম্পিউ, কাঁচরাপাড়া হাইস্কুল মোড়, কাঁচরাপাড়া, চলভাষ ঃ ৯৮৩৬২৭১২৫৩
সম্পাদক—শিবপ্রসাদ সরদার। ফোন ঃ ৯৪৩৩৩৩৪৩৮০) E.mail-ganabijnan@yahoo.co.in